শিল্পীর কল্পনা। নাসার সৌজন্যে

HD 209458b গ্রহটি থেকে ধূমকেতুর মতো গ্যাসীয় পুচ্ছ বেরিয়ে আসছে। গ্রহটি বৃহস্পতির থেকে বড়, কিন্তু মূল নক্ষত্রের একেবারে গা ঘেঁষে রয়েছে

দূর সূর্যে পৃথিবীর আত্মীয়ের খোঁজে

বি মা ন না থ

নতুন নতুন আবিষ্কারের দৌলতে, গ্রহদের জন্মবৃত্তান্ত, এমনকী গ্রহে প্রাণের উদ্ভব নিয়ে বিজ্ঞানীদের পুরনো ধারণাগুলো আমুল পালটে যাচ্ছে।

নামটা বিদঘুটে: GJ581g। শুনে মনে হবে নাম নয়, যেন কোনও সংকেত। আসলে একটা গ্রহ। বিজ্ঞানীরা একুশ শতকের প্রথম দশকে যে প্রায় হাজারটা নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন, সেই তালিকায় নেহাত অর্বাচীন। কিন্তু যেমন তেমন গ্রহ এটা নয়। অন্যসব গ্রহের তুলনায় এটাকেই সবচেয়ে বাসযোগ্য বলে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। যতটুকু আঁচ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, এই গ্রহে জল আছে। যে মরুতৃষ্ণা নিয়ে হন্যে হয়ে বিজ্ঞানীরা জলভরা গ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তার নিরিখে এটা একটা মূল্যবান আবিষ্কার বইকি। সে তুলনায় নামটা বড় রুক্ষশুষ্ক মনে হয়। তাই বিজ্ঞানীরা এর একটা ডাকনাম রেখেছেন, 'জার্মিনা'।

এবার হয়তো অনেকের খটকা লাগছে। হাজারটা নতুন গ্রহ? এগুলো কি প্লুটোর সেই নতুন সঙ্গীসাথী বামন গ্রহগুলো? না, এই নতুন আবিষ্কৃত গ্রহগুলো আমাদের সৌরমণ্ডলে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে না, ঘুরছে দূরে দূরে অন্য নানা নক্ষত্রকে ঘিরে। আর তাদের সংখ্যা থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, হয়তো আমাদের ছায়াপথের প্রত্যেকটা নক্ষত্রেরই নিজস্ব গ্রহমণ্ডল আছে। মনে হয় মানুষের মতো নক্ষত্ররাও পরিবারবর্গ নিয়ে থাকতে ভালবাসে। যদি দূরের গ্রহগুলোকে সহজে দেখতে পেতাম, তাহলে হয়তো আকাশের চেহারাটাই বদলে যেত, দেখতাম ঝিকমিক করতে থাকা তারাগুলোর চারিদিকে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে ছোট ছোট আলোর বিন্দু। এক-একটা নক্ষত্রের চারিদিকে আংটির গোছার মতো ঘুরছে

তার গ্রহগুলো। কিন্তু আকাশের এই চেহারাকে আমাদের কল্পনার চোখেই দেখতে হবে, কারণ এদের দেখা দুষ্কর বললেও কম বলা হয়।

বিজ্ঞানীরা যেসব পদ্ধতিতে এই নতুন গ্রহগুলো সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন, তার কথা শুনলে গায়ে শিহরন খেলে যায়। এই ধরনের গবেষণা যে আদৌ সম্ভব হতে পারে, প্রথমে শুনলে বিশ্বাস হয় না। আর এই সব নতুন আবিষ্কারের দৌলতে, গ্রহদের জন্মবৃত্তান্ত, এমনকী গ্রহে প্রাণের উদ্ভব নিয়ে বিজ্ঞানীদের পুরনো ধারণাগুলো আমুল পালটে যাচ্ছে। আসুন দেখা যাক আকাশের এই নতুন চিত্রটা আমাদের কী জানাচ্ছে।

তার আগে একটা মজার গল্প বলা যাক। অনেক আগেকার কথা, সময়টা সিপাহি বিদ্রোহেরও কয়েক বছর আগে। তখন মাদ্রাজের মানমন্দিরের অধিকর্তা ছিলেন এক মিলিটারি অফিসার। তাঁর নাম ছিল ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্টিফেন জেকব। তখনকার দিনের অনেক সামরিক অফিসার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে সার্ভের কাজ করতেন, এবং তাঁদের অনেকে পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানেও এসেছিলেন। ক্যাপ্টেন জেকব ১৮৫৫ সালে আকাশের বৃশ্চিক আর ধনুরাশির মধ্যবর্তী অঞ্চলে ওফিউকাস নক্ষত্রমণ্ডলীর এক তারার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে মনে করেন যে এই তারা ঘিরে কোনও গ্রহ ঘুরছে। ওই নক্ষত্রটা (বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম ৭০ ওফিউকি, অর্থাৎ ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর ৭০-তম উজ্জ্বল তারা) আসলে একটা জোড়-নক্ষত্র, অর্থাৎ দু'টি নক্ষত্র সেখানে একে অপরের চারিদিকে ঘুরছে। নিজেদের মধ্যে এই ভাবে তুর্কিনাচ নাচার জন্য তাদের মিলিত ঔজ্জ্বল্য মাঝে মাঝে কমে এবং বাড়ে।

ক্যাপটেন জেকব হিসেব করে দেখলেন, তাদের নিজেদের মহাকর্ষের জন্য যত জোরে ছোটাছুটি করা স্বাভাবিক, সেই গতি দিয়ে ঔজ্জ্বল্যের এই কমবেশি হওয়াটা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। এদের চারিদিকে যদি আরও কোনও বস্তু থাকে যার মহাকর্ষের টানে এদের গতি খানিকটা জটিল হয়ে ওঠে, তাহলে তাঁর পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর যেহেতু এই বাড়তি বস্তুটিকে দেখা যাচ্ছে না, তাই সেটা নক্ষত্র হতে পারে না। জেকব অনুমান করলেন হয়তো এটা একটা গ্রহ।

এই নিয়ে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধটি তখনকার দিনে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ১৮৯৬ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন, এবং এও বলেন যে, গ্রহটার এক-এক 'বছর' আমাদের পৃথিবীর প্রায় ৩৬ বছরের সমান। পরে অবশ্য অনেক তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন এমন একটা নক্ষত্র-জুটির চারিদিকে কোনও গ্রহ থাকলে তার কক্ষপথ স্থায়ী হতে পারে না—দুই নক্ষত্রের টানে টালমাটাল হয়ে তা কোথায় হারিয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন যে, ক্যাপ্টেন জেকব এবং অন্যান্যদের পর্যবেক্ষণে কোনও ভুল ছিল, যার জন্য তাঁদের একটা অদৃশ্য গ্রহের মহাকর্ষের কথা মনে হয়েছে।

ক্যাপ্টেন জেকবের ভবিষ্যদ্বাণী সফল না হলেও, তাঁর গবেষণা একেবারে বিফলে যায়নি। তাঁর পথ অনুসরণ করে প্রায় দেড়শো বছর পরে সত্যি সত্যি অন্য নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলের খবর পাওয়া গেছে। অবশ্য এই পদ্ধতি যে শুধু জেকবের মাথাতেই এসেছিল তা নয়। এর আগে প্রায় একই পদ্ধতিতে আমাদের সৌরমণ্ডলে নেপচুন-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেবার কোনও তারার গতি পর্যবেক্ষণ করে নয়, তখন পর্যন্ত জানা সবচেয়ে দূরের গ্রহ ইউরেনাস-এর গতি লক্ষ করে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

দেখা গিয়েছিল যে, ইউরেনাসের গতির মধ্যে কেমন যেন একটা এলোমেলো ভাব আছে, মাঝে মাঝে সে তার কক্ষপথ থেকে সরে যায়, আবার ফিরে আসে। যেন কারও নিশিডাক শুনে তার চলন স্খলিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা তখন বললেন, নিশ্চয় এই পদস্খলনের জন্য দায়ী তার সঙ্গী কোনও গ্রহ, যার কথা তখন পর্যন্ত কেউ জানত না। দেখা না গেলেও তার মহাকর্ষের টান দিয়ে সে তার অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। নিউটনের মহাকর্ষের অঙ্ক দিয়ে এও ভবিষ্যদ্বাণী করা হল কবে আকাশের কোন অংশে সেই গ্রহটাকে দেখা যাবে। তক্কে তক্কে ছিলেন বিজ্ঞানীরা। কোনও গোয়েন্দার কথামতো যেমন পুলিশবাহিনী তৈরি হয়ে থাকে অপরাধীকে হাতেনাতে ধরার জন্য। নির্দিষ্ট দিনে, থুড়ি রাত্তিরে, ওই দিকে দূরবিন তাক করতেই দৃষ্টিগোচর হল নতুন গ্রহটা—ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মতো মুখচুন করে থাকা নেপচুন।

ক্যাপ্টেন জেকবের মাথায় এই চিন্তাটাই খেলেছিল যে, দেখা না গেলেও মহাকর্ষের টানে আপাত-অদৃশ্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব জানা যেতে পারে। তবে ইউরেনাসের ওপর নেপচুন যতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে, সেই তুলনায় কোনও নক্ষত্রের ওপর একটা গ্রহের প্রভাব খুব সামান্য। এই টানের ফলে একটা নক্ষত্রের গতির যা কমবেশি হবে তার পরিমাণ নগণ্য। ওই সূক্ষ্ম তফাতটুকু মাপার কোনও উপায় ছিল না ক্যাপ্টেন জেকবের। এমনকী তার একশো বছর পরেও সেই ক্ষমতা ছিল না কারও।

তবে বিংশ শতাব্দির শেষ দুই দশকে এই গবেষণা একটা নতুন মোড় নেয়। সাধারণত নক্ষত্রের বর্ণালির মধ্যে যে সব কালো রেখা দেখা যায়, সেই রেখাগুলোর স্থান পরিবর্তন থেকে নক্ষত্রের গতি ঠাহর করা যায়। এর পেছনে রয়েছে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান ডপলারের একটা পরীক্ষার ফল। আজকাল সন্তানসম্ভবা মায়েদের একটা 'ডপলার' পরীক্ষা করাতে হয়, যাতে গর্ভস্থ বাচ্চার নড়াচড়া টের পাওয়া যায়,

কেপলার দূরবিনে শনাক্ত করা ভিন-সূর্যের পরিবারের কয়েকটি গ্রহের সঙ্গে সৌর গ্রহদের আয়তনের তুলনা।

মনে হয় মানুষের মতো নক্ষত্ররাও পরিবারবর্গ নিয়ে থাকতে ভালবাসে। যদি দূরের গ্রহগুলোকে সহজে দেখতে পেতাম, দেখতাম ঝিকমিক করতে থাকা তারাগুলোর চারিদিকে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে ছোট ছোট আলোর বিন্দু।

তার শ্বাসপ্রশ্বাসের খবর নেওয়া যায়। ডপলার আবিষ্কার করেছিলেন, যদি কোনও শব্দের উৎস আমাদের থেকে দূরে সরে যায় বা কাছে আসে তাহলে সেই শব্দের কম্পনাঙ্ক বাড়বে বা কমবে। অর্থাৎ সেই শব্দের 'স্বর'টা বদলে যাবে। এই জিনিসটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও লক্ষ করি। ধরুন একটা অ্যাম্বুলেন্স আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে—তখন তার সাইরেনের স্বর ক্রমশ উঁচু হতে থাকে। আর যখন সেটা আমাদের পেরিয়ে দূরে চলে যায়, তখন তার স্বরটাও ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসে।

যেহেতু আলোও এক ধরনের তরঙ্গ, তাই সাইরেনের আওয়াজের মতো বর্ণালির আলোর রেখাও ব্যবহার করা যেতে পারে। সূর্য তথা সব নক্ষত্রের বর্ণালিতে অসংখ্য কালো রেখা দেখা যায়, যেগুলো তৈরি হয় নক্ষত্রের বাইরের অংশে, সেখানকার বিভিন্ন অণু-পরমাণু নক্ষত্রের আলোর বিভিন্ন অংশ শুষে নেয় বলে। যে-রঙের আলো শুষে নেওয়া হয়, বর্ণালির সেই রঙের জায়গায় কালো রেখা দেখা যায়। এদের 'স্বর' যা কম্পনাঙ্ক একেবারে নির্দিষ্ট। তাই এই স্বরের অদলবদল হলে ডপলারের নিয়ম অনুযায়ী আমরা বলতে পারব নক্ষত্রটা নড়াচড়া করছে কি না, এবং তার গতি কত। অর্থাৎ তার আলোর রঙের হেরফের থেকে বোঝা যাবে সে কোনও গ্রহের ফেরে পড়েছে কি না। গ্রহটাকে প্রত্যক্ষ করা গেল না ঠিকই, কিন্তু তার টানাটানির চিহ্ন ধরা পড়ল। কবির ভাষায় 'তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।'

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে, কোনও গ্রহের মহাকর্ষের প্রভাবে গ্রহপতি নক্ষত্রটির নড়াচড়ার মাত্রা থাকে খুব সামান্য। এই গতিবেগ সাধারণত সেকেন্ডে কয়েক মিটারের মতো হয়। যেমন বৃহস্পতির জন্য সূর্য সেকেণ্ডে ১২ মিটার গতিতে খানিকটা ঘোরে। পৃথিবীর মতো ছোট গ্রহ হলে তার প্রভাব হবে আরও কম। উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায় মানুষের হাঁটার গতির মতো। এই গতিবেগ মহাকাশে গ্রহনক্ষত্রের গড়পড়তা গতিবেগের তুলনায় নগণ্য। একটা বিশাল নক্ষত্র তার নানান ধরনের ঘুরপাক খাওয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে এমন হেলতে দুলতেও চলছে কি না সেটা বার করা খড়ের গাদার মধ্যে ছুঁচ খোঁজার মতো কঠিন।

১৯৮০-র দশকে আমেরিকার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওফ্রি মার্সি নক্ষত্রের বর্ণালির কয়েকটা বিশেষ রেখার সাহায্যে এই ধরনের গতিবেগ পর্যবেক্ষণ করার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বর্ণালির মধ্যে আয়োডিন অণুর দ্বারা সৃষ্ট রেখা ব্যবহার করার জন্য তিনি নক্ষত্র থেকে আসা আলো আয়োডিন ভর্তি শিশির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। একে তো নক্ষত্রের আয়োডিন অণু আলোর কয়েকটা রং ছিনিয়ে নিয়েছে, তারপর গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো ল্যাবরেটরির আয়োডিন তাকে আরও নিঃস্ব করে ফেলে। এর ফলে ওই বর্ণালির কালো রেখাগুলো আরও গাঢ় হয়, এবং তাদের নড়াচড়াগুলো পরিষ্কার নজরে পড়ে। তিনি তাঁর ছাত্র পল বাটলারের সঙ্গে মিলে এই পদ্ধতি ধরে বেশ কয়েকটা নিকটবর্তী নক্ষত্রের ওপর গবেষণা শুরু করেন।

কিন্তু ১৯৯৫ সালে সুইজারল্যান্ডের দুই বিজ্ঞানী মাইকেল মেয়র এবং দিদিয়ের কুয়েলোজ তাঁদের টেক্কা দেন। তাঁরা পেগাসাস নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত সূর্যের মতন ভারি একটা তারা, ৫১-পেগাসি-র নড়াচড়া থেকে তার চারিদিকে ভ্রমণকারী একটি গ্রহের সন্ধান পান। নক্ষত্রটির গতিবেগ ছিল সেকেন্ডে প্রায় ৫০ মিটারের মতো, অর্থাৎ নিশিডাক দেওয়া গ্রহটি আমাদের বৃহস্পতির মতো বড়, এবং নক্ষত্রটি থেকে তার দূরত্ব বেশি নয়। মার্সি এবং বাটলারের যন্ত্রপাতি এর থেকেও কম গতিবেগ শনাক্ত করতে পারত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা এই নক্ষত্রের কথা ভাবেননি। এই ধরনের গবেষণার ফল বেশ কিছুটা নির্ভর করে কোন কোন নক্ষত্রের ওপর গবেষণা করা হচ্ছে সেই তালিকার ওপর। যাই হোক এই খবর পাওয়ার পর মার্সি এবং বাটলার তাঁদের যন্ত্র দিয়ে মেয়র ও কুয়েলোজ-এর আবিষ্কারের যথার্থতা প্রমাণ করেন।

দেখা গেল যে ৫১-পেগাসির গ্রহটি নক্ষত্রের চারিদিকে এক বার ঘুরে আসতে প্রায় চার দিন সময় নিচ্ছে। অর্থাৎ গ্রহটির কক্ষপথ নক্ষত্রের খুব কাছাকাছি, কিন্তু সেটা প্রায় বৃহস্পতির মতো বড়। যেহেতু নক্ষত্রের খুব কাছাকাছি তার চলাফেরা, তাই সেই গ্রহের তাপমাত্রাও হবে খুব বেশি। প্রশ্ন উঠেছিল, এমন একটা বড় গ্রহের তো নক্ষত্রের এত কাছে জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক নয়—তাহলে ৫১ পেগাসির ক্ষেত্রে সেটা কেন হয়েছে? যখন মার্সি এবং বাটলার ১৯৯৯ সালে দেবযানী (অ্যান্ড্রোমিডা) নক্ষত্রমণ্ডলীর একটা তারার চারিদিকে একাধিক গ্রহ আবিষ্কার করলেন, যেখানে একটা নয়, তিন-তিনটি বিশালাকার গ্রহ রয়েছে, তখন এই প্রশ্নটা আরও জোরদার হয়ে উঠল।

আমাদের সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের খুব বিশদ না হলেও মোটামুটি একটা ধারণা আছে। আমরা জানি যে একটা গ্যাসীয় নীহারিকা বা নেবুলা থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছিল এবং তারই বাকি অংশ থেকে গ্রহদের উৎপত্তি। নক্ষত্রের চারদিকে এই ধুলো আর গ্যাসের মেঘের মধ্যে প্রথমে কিছু পাথুরে কেন্দ্র দেখা দিয়েছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে বড় হয় আরও গ্যাস-ধুলো আকর্ষণ করে। এদিকে সূর্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি হওয়ার জন্য সেখান থেকে বেশির ভাগ গ্যাস বয়ে গিয়ে জড়ো হয় বাইরের দিকে।

তাই যখন এক-একটা পাথুরে কেন্দ্রের চারিদিকে গ্যাস-ধুলো জমাট বেঁধে গ্রহ তৈরি হয়েছিল, তার সাইজ এবং উপকরণ নির্ভর করেছিল সূর্য থেকে তার দূরত্বের ওপর। সূর্যের কাছাকাছি থাকলে সেখানে গ্যাসের অভাবে তৈরি হয়েছিল পাথুরে গ্রহ, যেমন বুধ-শুক্র-পৃথিবী আর মঙ্গলের মতো গ্রহ। কিন্তু সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকে পাথুরে কেন্দ্রগুলো তাদের

UCF-1.01। পৃথিবীর থেকেও ছোট এই গ্রহটি, কিন্তু তাপমাত্রা ৬০০° C

শিল্পীর কল্পনা। নাসার সৌজন্যে

গ্রহ-অনুসন্ধানী মহাকাশ-দূরবিন কেপলার। এক বছর আগে অকেজো হয়ে পড়েছে

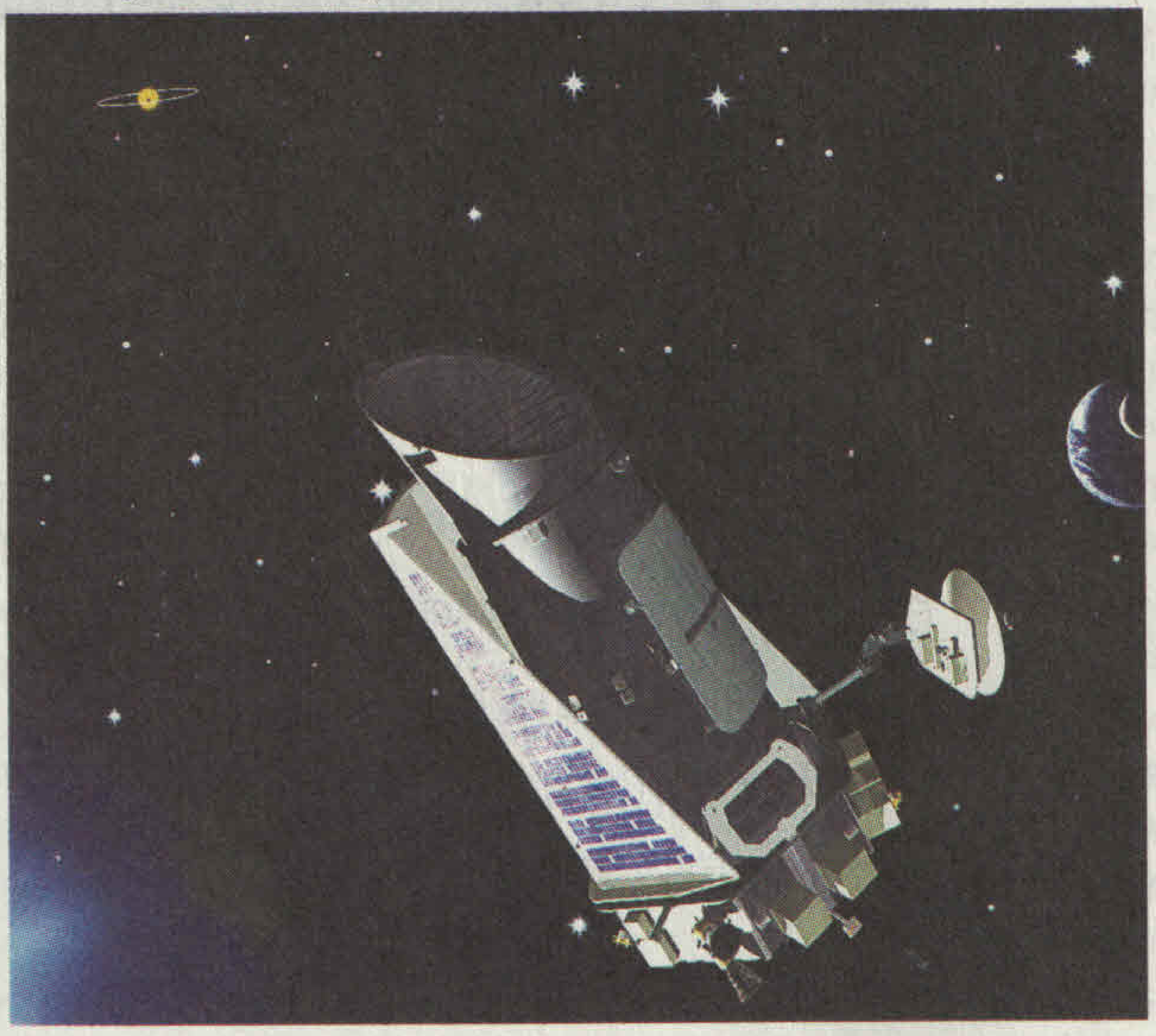

শিল্পীর কল্পনা। নাসার সৌজন্যে

চারিদিকে গ্যাস এবং ধুলো গায়ে মেখে ক্রমে বিশালাকার হয়েছিল, যেমন বৃহস্পতি-শনি-ইউরেনাস-নেপচুনের মতো গ্রহ।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী নক্ষত্রের খুব কাছে বৃহস্পতির মতো দানবাকার গ্রহের উৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু ১৯৯৫ সালের প্রথম আবিষ্কারের পর থেকে কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটা নতুন গ্রহ পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল যেখানে একটা বা কয়েকটা বিশাল গ্রহ কেন্দ্রের নক্ষত্রের এত কাছে রয়েছে যেন তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। নক্ষত্রের এত কাছে তাদের জন্ম হল কীভাবে? আর যদি দূরে জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে তারা গ্রহমণ্ডলের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল কী করে? এমন দৈত্যের মতন দেখতে পাহারাদার গ্রহদের তো অন্তঃপুরে পা বাড়ানোর কথা নয়?

এই নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। শুধু তাই নয়, এর ফলে আমাদের সৌরমণ্ডলে গ্রহের জন্ম নিয়ে আবার নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। পাড়ার অন্য পরিবারে ছেলেমেয়েদের বেয়াড়া আচরণ দেখলে নিজের ছেলেমেয়ের দিকে আবার নতুন করে নজর পড়ে। প্রশ্ন জাগে আমাদের সৌরমণ্ডলের অবস্থা কি অস্বাভাবিক না এটাই স্বাভাবিক, মানে এমনটা হওয়া কি বিরল না এইটাই রীতি? যদি সৌরমণ্ডলের অবস্থা ব্যতিক্রমী হয়, তার মানে কি এই যে অন্য নক্ষত্রের চারিদিকে আমাদের পৃথিবীর মতো গ্রহ খোঁজা অর্থহীন?

এই অদ্ভুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে অনেক বললেন যে, যেহেতু নক্ষত্রের গতির সাহায্যে গ্রহের খোঁজ করা হচ্ছে তাই প্রথম দিকে, অর্থাৎ যখন মাপজোক খুব একটা উঁচুমানের হয়ে দাঁড়ায়নি, তখন স্বাভাবিকভাবেই বেয়াড়া নক্ষত্রগুলোর দিকে নজর পড়বে যাদের হেলদোলটা বেশি, অর্থাৎ যাদের পরিবারের গ্রহগুলো বড়সড়। কিন্তু তাই বলে হুট করে এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে সব গ্রহমণ্ডলই এই রকম বেখাপ্পা ধরনের। খবরের কাগজ চালাতে কিছু খারাপ খবর বড় করে ছাপতেই হয়, কারণ তাতে কাগজ বিক্রি হয় ভাল। স্বাভাবিক ভাবে কাগজ খুললে খুন-ছিনতাইয়ের খবরই প্রথমে চোখে পড়ে। কিন্তু কোনও জায়গার খবরের কাগজে খুনখারাপির কথা পড়ে কি এমন মনে করা ঠিক হবে যে সেখানকার সব বাসিন্দাই মারকুটে টাইপের?

এর বেশ কয়েক বছর পর, যখন নক্ষত্রের গতি মাপার পর্যবেক্ষণ আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠল, তখন নতুন খবর আসতে শুরু করল। বিংশ শতাব্দি ফুরোতে না ফুরোতেই এমন কিছু নক্ষত্রের কথা জানা গেল যাদের চারিদিকে বড় গ্রহ ছাড়াও পৃথিবীর মতো গ্রহও রয়েছে। যেমন কর্কট মণ্ডলীর ৫৫ নম্বর তারা, বা গ্লিসে ৮৭৬। ১৯৯৯ সালে আর-একটা আবিষ্কারও বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছিল। নক্ষত্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহেরা কখনও কখনও নক্ষত্রের সামনে এসে তাকে কিছুটা ঢেকে দেয়—এমন নক্ষত্র-গ্রহণের সময় নক্ষত্রের আলো কিছুটা হ্রাস পায়। ঔজ্জ্বল্যের এই তারতম্য থেকেও গ্রহের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেতে পারে।

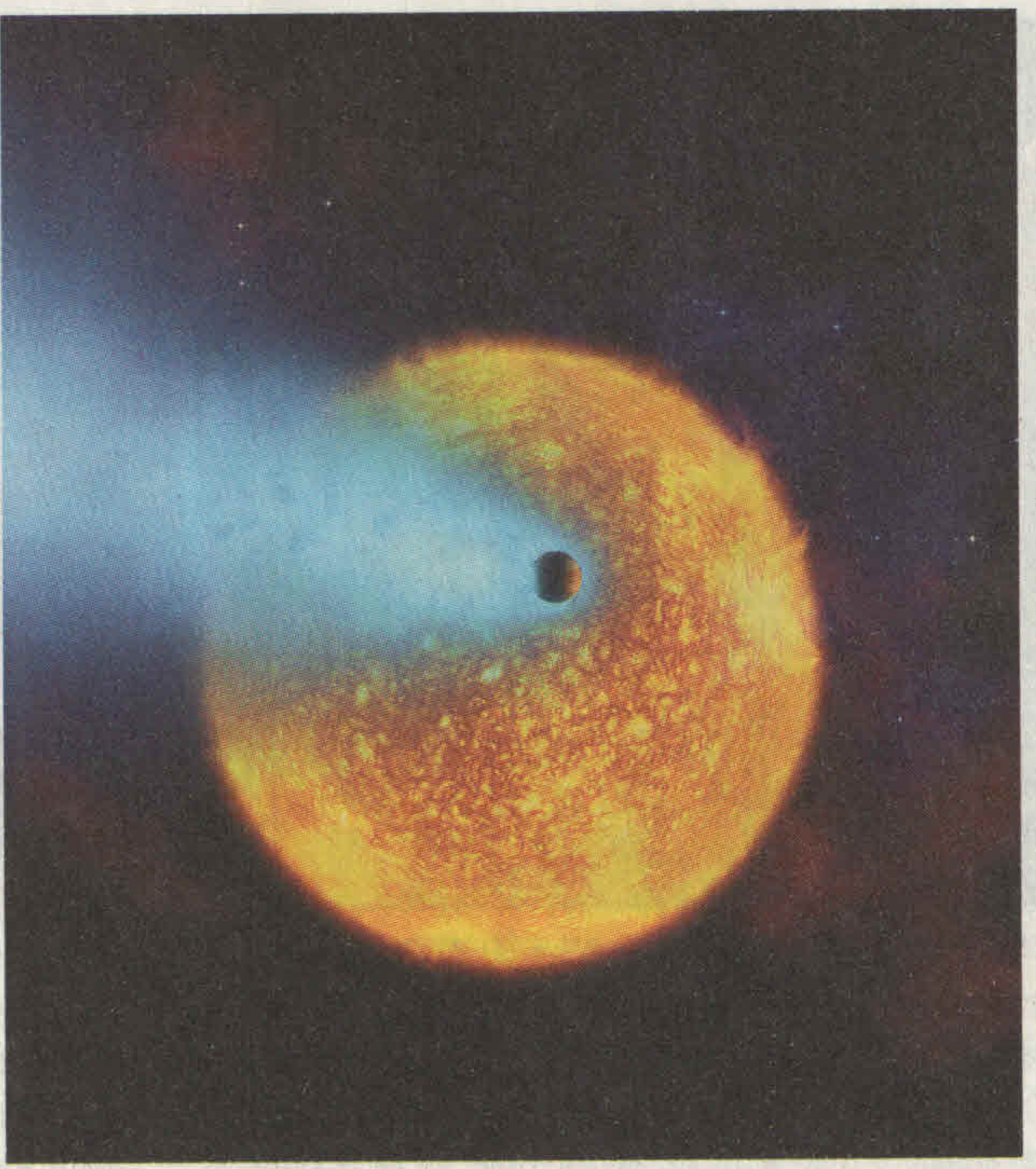

শিল্পীর কল্পনা। নাসার সৌজন্যে

HD 209458b। সম্ভবত এতে জল আছে, কিন্তু জননী তারার অতি নিকটে থাকার ফলে গ্রহটি থেকে বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত উবে যাচ্ছে

সেই বছর এই নিয়মে HD 209488B নামের একটি তারার চারিদিকে একটা গ্রহের খোঁজ পাওয়া গেল। এই পদ্ধতিতে একটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় কারণ কিছু কিছু নক্ষত্রের দীপ্তি আপনা থেকেই কমবেশি হয়। আবার কিছু সুবিধেও আছে, যেমন এই পদ্ধতিতে গ্রহটার সাইজ সম্বন্ধেও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তাছাড়া যেহেতু এই ক্ষেত্রে নক্ষত্রের আলো গ্রহটার বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের কাছে আসে, তাই গ্রহণের সময় নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে গ্রহটার বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। কারণ গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অণুগুলো নক্ষত্রের আলো কিছুটা শুষে নেবে। এটাকে এক্স-রে করে শরীরের হাড়গোড়ের সন্ধান পাওয়ার মতো ব্যাপার বলা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দি ফুরোতে না ফুরোতেই এমন কিছু নক্ষত্রের কথা জানা গেল যাদের চারিদিকে বড় গ্রহ ছাড়াও পৃথিবীর মতো গ্রহও রয়েছে। যেমন কর্কট মণ্ডলীর ৫৫ নম্বর তারা, বা গ্লিসে ৮৭৬।

২০০৯ সালে বিজ্ঞানীরা এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে জল, মিথেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চিহ্ন পেলেন। সেই বছর আরও একটা গ্রহের খোঁজ পাওয়া গেল যার তাপমাত্রা এত বেশি যে তার বায়ুমণ্ডলের অণুপরমাণুরা শুধু আলো শুষে নিচ্ছে না, নিজেও কিছুটা আলো বিকিরণ করছে। TrES-3 (Trans-Atlantic Exoplanet Survey-র সূত্রে দেওয়া নাম) নক্ষত্রের একটা গ্রহ, TrEs-3b, যার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস, তার থেকে বিকিরিত ক্ষীণ অবলোহিত আলো দেখতে পেলেন বিজ্ঞানীরা। পরিষ্কার না দেখা গেলেও, গ্রহটা আর অদৃশ্য রইল না। যার বাঁশির ডাক এতদিন শোনা গিয়েছিল, তাকে এবার দেখাও গেল।

আমরা জানি, সৌরমণ্ডলের গ্রহদের নিজস্ব আলো নেই। অন্য নক্ষত্রের গ্রহগুলোও তাই। তারা তাদের নক্ষত্রের আলোই বিচ্ছুরিত করে. তবে তাদের নিজের কোনও বিকিরণ নেই বললে ভুল বলা হয়। প্রত্যেকটা বস্তুই তার নিজের তাপমাত্রা অনুযায়ী কিছু না কিছু আলো বিকিরণ করে। আমরাও করি—তবে সেটা অবলোহিত আলো, খালি চোখে দেখা যায় না, রাত্তিরে জঙ্গলেও অবলোহিত আলোর ক্যামেরা দিয়ে অনেক সময় জন্তুজানোয়ারদের দেখা যায়, ছবিও তোলা যায়। আজকাল সৈন্যরাও এমন আলো দেখার চশমা ব্যবহার করেন, রাত্তিরে লুকিয়ে লুকিয়ে শত্রুর ডেরায় ঢোকার জন্য।

গ্রহগুলোও এই অবলোহিত আলো বিকিরণ করে, কিন্তু এই আলো দেখার মতো বিশেষ দূরবীক্ষণ যন্ত্র চাই। ২০০৪ সালে চিলে-তে অবস্থিত আট মিটার ব্যাসের এক বিশাল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম দৃষ্টিগোচর হল 2M1207 নামের একটি নক্ষত্রের একটি বিশাল গ্রহ।

চক্ষুকর্ণের এই বিবাদভঞ্জনের পর গ্রহ খোঁজার গবেষণায় আর কোনও সন্দেহ রইল না। মহাকাশে পাঠানো কয়েকটি অবলোহিত আলোর দূরবীক্ষণ যন্ত্র এই গবেষণায় এখন সাহায্য করছে। অনেক ক্ষেত্রে মূল নক্ষত্র থেকে আসা আলো একটা চাকতি দিয়ে ঢেকে তার চারপাশের গ্রহগুলো থেকে আসা ক্ষীণ অবলোহিত আলোর সাহায্যে তাদের ছবি তোলা হয়েছে।

এই গবেষণায় সাহায্য করতে ২০০৯ সালের মার্চ মাসে একটা কৃত্রিম উপগ্রহে বসানো দূরবীক্ষণ যন্ত্র ‘কেপলার’ পাঠানো হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দির বিজ্ঞানী জোহানেস্ কেপলার, যিনি প্রথম সূর্যের চারিদিকে গ্রহদের কক্ষপথের সঠিক আকার বার করেছিলেন, তাঁকে স্মরণ করে এই যন্ত্রের নামকরণ। এই যন্ত্র এমনভাবে বানানো হয়েছিল যাতে অন্য নক্ষত্রের চারিদিকে শুধু বড় গ্রহ নয়, পৃথিবীর মতো ছোটখাটো গ্রহেরও খোঁজ করা যেতে পারে। নানান নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য থেকে, অর্থাৎ তাদের আংশিক গ্রহণ থেকে গ্রহগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে। এর যন্ত্রপাতিগুলো ছিল সাংঘাতিক সংবেদনশীল। কোনও নক্ষত্রের আলোর যদি এক লক্ষ ভাগের এক ভাগও কমবেশি হয়, তাহলেও ‘কেপলার’-এর যন্ত্রপাতিতে তার চিহ্ন ধরা পড়ত। এই ধরনের আংশিক গ্রহণ আবিষ্কার করার জন্য কেপলার তার পলকহীন দৃষ্টিতে একসঙ্গে ধরে রেখেছিল প্রায় লক্ষ খানেক তারা। দুর্ভাগ্যবশত কেপলারে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও কাজ চালানো যাচ্ছিল, কিন্তু ২০১৩র মে মাসের মাঝামাঝি নতুন এক গোলযোগ দেখা দেয়, যার ফলে তাকে আর কর্মক্ষম রাখা যায়নি। কেপলারের দিনাবসানের কথা ওই বছর আগস্টে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে এরকম আর-একটি মহাকাশযান, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) পাঠানোর পরিকল্পনা চলেছে, যা কেপলারের আরব্ধ কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। হয়তো পৃথিবীর মতো আরও অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে।

অবশ্য শুধু পৃথিবীর মতো গ্রহ আবিষ্কার করলে ব্যাপারটা যতটা চমকপ্রদ হবে, তার থেকেও বেশি হবে যদি দেখা যায় গ্রহটায় প্রাণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন অন্য গ্রহ খোঁজার গবেষণার চরিত্রটাই বদলে যাবে। গ্রহান্তরের কথা ভাবতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহান্তরের জীবের কথা এসে পড়ে। মানুষ কি এই ব্রহ্মাণ্ডে একা?

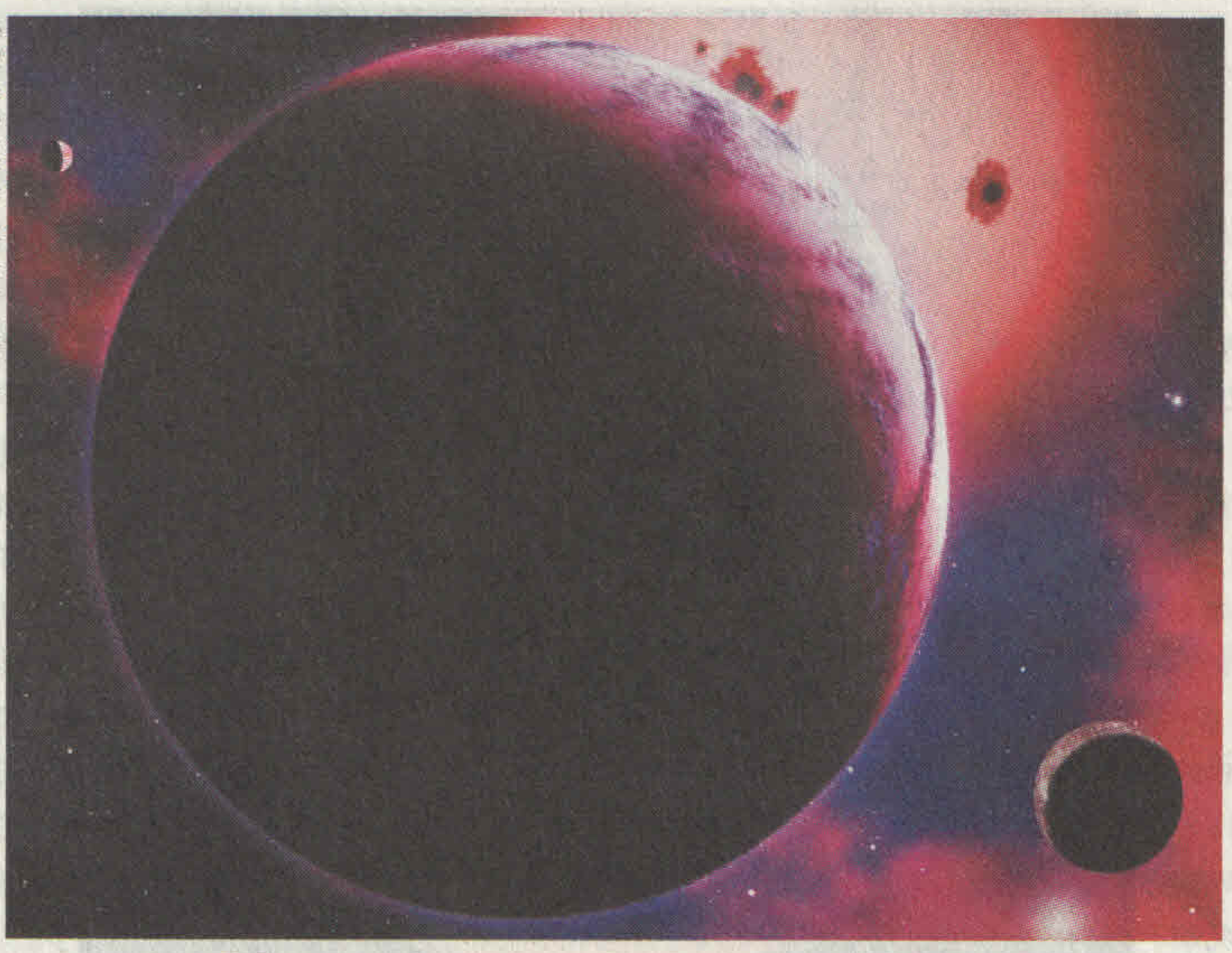

শিল্পীর কল্পনা। নাসার সৌজন্যে

GJ1214B। পৃথিবীর থেকে প্রায় সাতগুণ ভারি। তাপমাত্রাও ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি

এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সূচনাতেই যেখানে প্রথম হোঁচট খেতে হয়, সেটা হল আর একটা প্রশ্ন—আকাশের নক্ষত্ররাজির মধ্যে কতগুলো গ্রহ রয়েছে? আর তাদের কতগুলোর মধ্যে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা বেশি? এই দুটো প্রশ্নের কোনও সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না অনেকদিন। এই ধরনের বিতর্ক পাশ কাটিয়ে যাওয়া হত, বা বড়জোর একটা অনুমান করা হত। কিন্তু বর্তমান গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হওয়ার সাহস পেয়েছেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, গড়পড়তায় প্রায় প্রত্যেক নক্ষত্রেরই একটা গ্রহমণ্ডল রয়েছে। এক দল বিজ্ঞানী গত ছয় বছর ধরে একটা নতুন পদ্ধতিতে গ্রহ খুঁজছেন। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বে যে কোনও বস্তু তার চারিদিকের দেশকাল দুমড়ে ফেলে, এবং সেখান দিয়ে চলার সময় আলোর পথও বেঁকে যায়। যখন কোনও দূরের নক্ষত্রের আলো একটা গ্রহের পাশ ঘেঁষে আমাদের চোখে এসে পড়বে তখন তার পথ সামান্য হলেও কিছুটা বেঁকে যাবে। কিন্তু গ্রহগুলো চঞ্চল ছেলেমেয়েদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই এদের জন্য কোনও দূরের নক্ষত্রের আলো আমাদের নজরে পড়লে, সেই আলো আমরা স্থির দেখব না, মনে হবে কাঁপছে। এর মাপজোক করে এক দল বিজ্ঞানী সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমাদের ছায়াপথে কম করেও হাজার কোটি ছোট অর্থাৎ পৃথিবীর আকারের গ্রহ আছে। ছায়াপথে যেহেতু নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় একশো কোটি, তাই তাদের মতে গড়পড়তায় প্রত্যেক নক্ষত্রের একটা গ্রহমণ্ডল রয়েছে।

শুধু পৃথিবীর মতো গ্রহ আবিষ্কার করলে ব্যাপারটা যতটা চমকপ্রদ হবে, তার থেকেও বেশি হবে যদি দেখা যায় গ্রহটায় প্রাণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন অন্য গ্রহ খোঁজার গবেষণার চরিত্রটাই বদলে যাবে।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ওই গ্রহগুলোর মধ্যে কতগুলো প্রাণের অনুকূল হতে পারে। কোনও গ্রহে প্রাণ থাকার সম্ভাবনার কথা আলোচনা করার সময় বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের চারিদিকে একটা বাসযোগ্য অঞ্চল বা হ্যাবিটেবল জোন কল্পনা করেন। প্রাণের জন্য কয়েকটা জিনিস অত্যাবশ্যক, যেমন তরল জল। আর সে সব পদার্থ থাকতে গেলে গ্রহটিকে কেন্দ্রের নক্ষত্র থেকে একটা মাঝামাঝি দূরত্বে চলাফেরা করতে হয়। যেমন আমাদের সৌরমণ্ডলের ক্ষেত্রে বুধ-শুক্রের মতো গ্রহে প্রাণের আশা করা বৃথা, কারণ ওই দুটো গ্রহের তাপমাত্রায় জল থাকলেও বাষ্পীয় অবস্থায় থাকবে। আবার মঙ্গলের মতো দূরত্বে তাপমাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে বড্ড কম। সৌভাগ্যবশত আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথ এই বাসযোগ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়েই গিয়েছে। কিন্তু আমাদের পৃথিবী কি একটা ব্যতিক্রমী গ্রহ, না এই অঞ্চলে এমন একটা গ্রহ থাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয়?

মূল নক্ষত্র থেকে বাসযোগ্য অঞ্চলের দূরত্ব কত হতে পারে? সূর্যের মতন নক্ষত্রের বেলায় এই অঞ্চল মোটামুটি সূর্য-পৃথিবীর দূরত্বে অবস্থিত। নক্ষত্রটি আরও বড় আর উজ্জ্বল হলে স্বাভাবিক ভাবে এই অঞ্চল আরও দূরে হবে। কারণ তেমন একটা উত্তপ্ত নক্ষত্রের ছত্রছায়ায় থেকে গ্রহের তাপমাত্রা মাঝামাঝি মাপের রাখতে গেলে তুলনায় দূরে থাকাই শ্রেয়। আবার ছোট বা ঈষদুষ্ণ নক্ষত্র হলে তার কাছাকাছি ঘেঁষে থাকা ভাল, তার ওম পাওয়া যায়। অবশ্য নক্ষত্রেরও বিবর্তন হয়, তাদের ঔজ্জ্বল্য কমবেশি হয়, এবং বাসযোগ্য অঞ্চলের দূরত্বও সেই অনুসারে কমে বাড়ে।

কেপলার-এর পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত পঞ্চাশেরও বেশি এমন গ্রহ খুঁজে পেয়েছেন যেগুলো এই রকম মাঝামাঝি দূরত্ব

থেকে ঘুরছে। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, বাসযোগ্য অঞ্চলে গ্রহ থাকা বিরল ঘটনা নয়। কিন্তু তাই বলে সেখানকার সব গ্রহেই যে প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় তরল জল থাকবে সেটা পুরোপুরি প্রমাণ হয় না। ভাবতে হয় পৃথিবীতে জল কোথা থেকে এসেছে সেই প্রশ্ন নিয়ে। আমাদের এই সসাগরা পৃথিবীর জল কি প্রথম থেকেই ছিল, না কি এর একটা বড় অংশ বাইরে থেকে এসেছে?

বিজ্ঞানীরা এখনও এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাননি। অনেকের মতে যে গ্যাস-ধুলোর মিশ্রণ থেকে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে, তার মধ্যেই বেশ কিছু পরিমাণে জল ছিল। সেই জলের কিছু অংশ অবশ্য পৃথিবীর শৈশবকালের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় উবে যাওয়ার কথা। কতটুকু জল এখানে বাকি পড়ে ছিল সেটা জানতে গেলে পৃথিবীর প্রথম দিকে তাপমাত্রার বিবর্তনের কথা জানতে হয়, যা নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে।

আবার অনেকের মতে সৌরমণ্ডলে ঘুরে বেড়ানো ধূমকেতু থেকেই পৃথিবীর বেশির ভাগ জল এসেছে। ধূমকেতুর মূল উপকরণ হল বরফ, গ্যাস আর ধুলোবালি। হতে পারে কোটি কোটি বছর ধরে যেসব ছোট বড় ধূমকেতু পৃথিবীতে এসে আছড়ে পড়েছে, তাদের বরফ গলে গিয়ে পৃথিবীতে জলবর্ষণ করে এসেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু বাসযোগ্য গ্রহ খুঁজলেই চলবে না, তার মধ্যে জল আছে কি না তার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত মনে খুঁতখুঁত থেকেই যাবে। এই জন্যই আলোচনার প্রথমে যে একটা অদ্ভুত নামের গ্রহ, GJ581g-র কথা বলা হয়েছিল, তার আবিষ্কারটা গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা গ্রহ নিয়েও জোর গবেষণা চলছে। তার নাম GJ1214B। এই গ্রহটার যে একটা বায়ুমণ্ডল রয়েছে সেটা ২০০৯ সালেই জানা গিয়েছিল। এর পরের বছর তাতে জলেরও খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। এর পরে ২০১২ সালের প্রথম দিকে হাব্‌ল্‌ মহাকাশ দূরবীক্ষণের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা তার বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসা নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে এই গ্রহে জলের পরিমাণ নেহাত কম নয়।

গ্রহটা পৃথিবীর তুলনায় প্রায় সাতগুণ ভারি, কিন্তু তার এক 'বছর' মোটে ৩৮ ঘণ্টা, অর্থাৎ নক্ষত্র থেকে তার দূরত্ব খুব কম। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন তার আবহাওয়া হবে বেশ উত্তপ্ত—গড় তাপমাত্রা খুব সম্ভবত ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। এবারে

শুধু আলোর বর্ণালিতে জলের চিহ্ন না খুঁজে কেউ কেউ সাগরের জল থেকে আলোর বিচ্ছুরণের সন্ধান করতে শুরু করেছেন। কয়েক বছর আগেও এই কথা বললে খোদ বিজ্ঞানীরাই হয়তো একে কল্পবিজ্ঞান বলে উড়িয়ে দিতেন।

প্রশ্ন দাঁড়াবে, এমন সসাগরা গ্রহে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? আগামী কয়েক বছরে এই নিয়ে আরও নতুন খবর জানা যাবে।

অন্য নক্ষত্রের চারিদিকে গ্রহ খোঁজার গবেষণায় বলতে গেলে একটা ছোটখাটো বিপ্লব এসেছে। গ্রহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগ্রহে একটা জোয়ার এসেছে। প্রতিবছর কম করেও প্রায় সত্তর-আশিটা নতুন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে গত কয়েক বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে হরেক রকম গ্রহ রয়েছে—যাদের কক্ষপথ, বায়ুমণ্ডলের উপকরণ, যাদের মাতৃ-নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য, ইত্যাদির রকমফের থেকে বিজ্ঞানীরা অনেক ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। অনেক নতুন পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে। যেমন শুধু আলোর বর্ণালিতে জলের চিহ্ন না খুঁজে কেউ কেউ সাগরের জল থেকে আলোর বিচ্ছুরণের সন্ধান করতে শুরু করেছেন। কয়েক বছর আগেও এই কথা বললে খোদ বিজ্ঞানীরাই হয়তো একে কল্পবিজ্ঞান মনে করে উড়িয়ে দিতেন।

বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের অধ্যাপক সুজন সেনগুপ্ত আর-একটা নতুন পদ্ধতির প্রস্তাবনা করেছেন। যদি এমন কোনও গ্রহের বায়ুমণ্ডল থাকে তাহলে নক্ষত্রের আলো সেই বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার সময় আলোর তরঙ্গ খানিকটা একমুখী অর্থাৎ পোলারাইজড হয়ে পড়বে। আলোর এই বৈশিষ্ট্য থেকেও বায়ুমণ্ডল আছে এমন গ্রহের সন্ধান করা যেতে পারে বলে তাঁর ধারণা।

ভাবতে অবাক লাগে মাত্র পঁচিশ বছর আগেও এই ধরনের গবেষণার পেছনে লেগে থাকা বিজ্ঞানীদের ব্রাত্য বলে গণ্য করা হত। এক সময় জিওফ্রি মার্সি নক্ষত্রের গায়ে চৌম্বকক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করতেন, এবং এক সময় হতাশ হয়ে নতুন কিছু করার জন্য গ্রহ খুঁজতে লেগেছিলেন। তাঁর ছাত্র পল বাটলার যখন এই বিষয়কে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য বেছে নেন, তখন তাঁকেও অনেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। কোথাও সুযোগ না পেয়ে আমেরিকার অন্য প্রান্তে এসে তিনি মার্সির পদ্ধতিকে উন্নত মানের করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের যুগ্ম অধ্যবসায়ে কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটা নতুন অধ্যায় রচনা করতে পেরেছিলেন।

বর্তমানে 'এক্সোপ্ল্যানেট' অর্থাৎ অন্য নক্ষত্রের গ্রহের গবেষণায় দুরন্ত গতি এসেছে। এবারে এই প্রশ্নে জীববিদ্যার বিজ্ঞানীরাও কৌতূহলী হয়েছেন। গত শতাব্দির সত্তরের দশকে যখন গ্রহান্তরে জীবনের সন্ধান নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল, অনেক প্রশ্নের উত্তর তখন দেওয়া সম্ভব হয়নি, ফলে সেই সব আলোচনা অনেক সময় বৈজ্ঞানিক না হয়ে একটা রোমান্টিক রূপ নিত। এখন এই নতুন গবেষণার দৌলতে সেই সব প্রশ্ন নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক করা যেতে পারে।

GJ581g। ডাকনাম জার্মিনা। পৃথিবীসদৃশ গ্রহদের অন্যতম

শিল্পীর কল্পনা। নাসার সৌজন্যে

পৃথিবীর মতো গ্রহ যে বিরল নয়, এই কথাটা এখন নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে আমরা আরও অনেক নতুন গ্রহের খবর জানতে পারব। কে জানে হয়তো এদের মধ্যে কোথাও প্রাণের সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে। কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মতো কোনও নাটকীয় ঘটনা না ঘটলেও, ওই ধরনের জীবদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না হলেও, অন্তত আকাশের দিকে তাকালে এই ব্রহ্মাণ্ডকে আর নির্জন মনে হবে না। চিরপরিচিত রাতের আকাশকে আমরা নতুন করে দেখব তখন।